

স্টারি অব বিস্ময়

আলমে আরওয়াহ থেকে দুনিয়া সফরের ইতিহাস

ওমর সুলেইমান
অনুবাদ ॥ আলী আহমাদ মাবরুর



শাইখ ওমর সুলেইমানের লেকচার সিরিজ

স্টোরি অব বিগিনিং

(আলমে আরওয়াহ থেকে দুনিয়া সফর)

অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর



গাডিয়ানা

পা ব লি কেশ ন স

শাইখ ওমর সুলেইমানের লেকচার সিরিজ
স্টোরি অব বিগিনিং
 (আলমে আরওয়াহ থেকে দুনিয়া সফর)

অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

প্রকাশনায়

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮

guardianpubs@gmail.com

www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com

প্রথম প্রকাশ : ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

অনুবাদস্বত্ব : গার্ডিয়ান পাবলিকেশনস

শব্দ বিন্যাস : গার্ডিয়ান টিম

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ

মুদ্রণ : একতা অফসেট প্রেস

১১৯, ফকিরাপুল, জবেদা ম্যানশন, মতিঝিল, ঢাকা।

হার্ডকভার মূল্য : ৩৫০

পেপারব্যাক মূল্য : ৩২০

ISBN- 978-984-8254-52-3

Story of Beginning by Shaikh Omar Suleiman Published by
 Guardian Publications, Price TK. 350 (HC)/TK. 320 (PB) Only.

প্রকাশকের কথা

‘নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিতে এবং দিবা-রাত্রির আবর্তনে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে— হে আমাদের প্রতিপালক! এ সবকিছু তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। সব পবিত্রতা একমাত্র তোমারই। আমাদের তুমি দোজখের শাস্তি হতে বাঁচাও।’ সূরা আলে ইমরান ১৯০-৯১

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজকের দুনিয়ার মুসলমানরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টিতত্ত্ব ও নিদর্শন নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা থেকে অনেক দূরে। অথচ জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গন্তব্য ঠিক করে নিতে এসব জ্ঞান মুমিন জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। জ্ঞানের অনেক শাখার ভিড়ে এসব জ্ঞানের চর্চা সময়ের অনিবার্য দাবি।

উত্তর আমেরিকার তরুণ স্কলার শাইখ ওমর সুলেইমান হারিয়ে যাওয়া এই আলোচনা নতুন করে মুসলিম মানসে ফিরিয়ে আনার একটা উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রখ্যাত স্কলার ইবনে কাসিরের বিখ্যাত গ্রন্থ ‘বিদায়া ওয়ান নিহায়া’র ওপর ভিত্তি করে শাইখ ওমর সুলেইমান বাইয়্যিনা টিভিতে ৭০ পর্বের ধারাবাহিক বক্তব্যে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রাসঙ্গিক আলোচনা দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সাধারণত এমন আলোচনা গুরুগম্ভীর ও নিরস হয়; কিন্তু এখানে প্রাণ আছে, গতি আছে, রহস্য আর গভীরতা আছে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এক নতুন আঙ্গিকে জ্ঞান জগতের অন্যতম একটা অংশকে আত্মস্থ করে ঋদ্ধ হবেন, ইনশাআল্লাহ।

এই বইটির পেছনের কারিগর ইবনে সিনা ট্রাস্ট-এর সিনিয়র এজিএম জনাব জাহিদুর রহমান। লেখকের অনুমতিসহ অনুবাদের কাজটা তিনিই শুরু করেছিলেন। আলী আহমাদ মাবরুর ভাই তাঁর স্বভাব-গুণে একটা প্রাণবন্ত অনুবাদ উপহার দিয়েছেন। গার্ডিয়ান এই বইটার সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত। বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা

মুখবন্ধ

মহাবিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টিই এক একটি নতুন বিস্ময়। সৃষ্টিজগতের যেকোনো একটি অংশ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে এর পেছনের মহান কারিগরের সন্ধান পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কালামে পাকে অনেক জায়গায় তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জানা এবং চিন্তা-গবেষণা করার তাগিদ দিয়েছেন। যেসব মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার প্রত্যাশায় তাঁর সৃষ্টিজগৎ নিয়ে কাজ করছেন, তিনি তাদেরকে এক ধরনের বিশেষ মর্যাদাবান মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফাসসির ইবনে কাসির (রহ.) তাঁর রচিত *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে আল্লাহ তায়ালায় সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.)-এর এই গ্রন্থটি মোট ১০ খণ্ডে সমাপ্ত করেছেন। উত্তর আমেরিকার ইসলামিক স্কলার শাইখ ওমর সুলেইমান এই গ্রন্থ অবলম্বনে প্রায় দুবছরব্যাপী ‘The Beginning and Ends’ শিরোনামে আলোচনা উপস্থাপন করেন। সিরিজটি পাঠক-শ্রোতাদের মাঝে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।

আমি শাইখ ওমর সুলেইমানের বক্তব্য শুনি বহুদিন থেকে। বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় তাঁর তথ্যবহুল ও প্রাঞ্জল উপস্থাপনা শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে। বিশেষ করে তাঁর আরবি ও ইংরেজি বলার ধরন আমার কাছে মোহনীয় মনে হয়। ‘The Beginning and Ends’ শিরোনামে তাঁর লেকচার সিরিজটি যখন শুনছিলাম, তখনই মনে হয়েছে— জ্ঞানের মণিমুক্তা ছাড়ানো এ সিরিজটি যদি বাংলায় অনুবাদ করা যায়, তাহলে বাংলাভাষী পাঠকদের জ্ঞানের রাজ্যে একটি নতুন সংযোজন হবে।

পরবর্তীকালে ওমর সুলেইমানকে ই-মেইল করে সিরিজটি বাংলায় অনুবাদ করার অনুমতি চাই। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে অনুমতি প্রদান করেন, সেইসঙ্গে তাঁর বর্তমান কাজগুলোকে বাংলায় অনুবাদের বিষয়ে তাঁর সম্মতির কথা জানান।

পরবর্তীকালে প্রিয়মুখ আলী আহমাদ মাবরুর অত্যন্ত যত্নসহকারে পেরেশানি ও পেশাদারিত্বের সাথে অনুবাদের কাজটি সম্পন্ন করেছেন এবং গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স বইটি পাঠকদের কাছে তুলে দেওয়ার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন। এ জন্য তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আলী আহমেদ মাবরুরের অনুবাদ গতিময় ও সুখপাঠ্য। ইতোমধ্যে তাঁর অনূদিত বেশ কয়েকটি বই পাঠকমহলে বেশ সমাদৃত হয়েছে। আশা করি এই বইটিও পাঠকদের আশা ও তৃপ্তি মেটাতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

বইটি পাঠকদের চিন্তা ও কর্ম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম অবদান রাখতে পেরেছে জানলে আমাদের চেষ্টা ও পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। হে আমাদের প্রতিপালক! এই বইটি তোমার সন্তুষ্টির জন্য কবুল করো। (আমিন)

মুহাম্মদ জাহিদুর রহমান

সিনিয়র এজিএম, ইবনে সিনা ট্রাস্ট

অনুবাদের কথা

শাইখ ওমর সুলেইমান একজন তরুণ ইসলামিক স্কলার। জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করে স্থানীয়ভাবে বেশ ভালো পরিচিতি পেয়েছেন। তা ছাড়া ধর্মীয় বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা এবং জ্ঞানগর্ভ উপস্থাপনা বিশ্বজুড়ে তাকে প্রবল জনপ্রিয় করে তুলেছে। তিনি ইয়াক্বিন ইন্সটিটিউট ফর ইসলামিক রিসার্চের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। কর্মজীবনে তিনি সাউদার্ন মেথোডিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজের একজন অধ্যাপক।

২০১৫ সালে জনপ্রিয় অনলাইন ইসলামিক টিভি ‘বাইয়েনাহ’র জন্য তিনি একটি লেকচার সিরিজ শুরু করেছিলেন। লেকচারটি ছিল ইবনে কাসিরের বিখ্যাত গ্রন্থ *আল বিদায়া আর নিহায়া* তথা দ্যা বিগিনিং অ্যান্ড দ্যা ইন্ড-এর ওপর। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই লেকচার সিরিজটি শুরু হয়ে ২০১৬ সালের মার্চ অবধি চলে। প্রায় এক বছর ধরে মোট ৭০টি পর্ব এই সিরিজে প্রচারিত হয়।

ইন্টারনেটের সুবাধে এই সিরিজটি দেখার সুযোগ পাই এবং গোটা আলোচনাটি অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যবহুল হওয়ায়, তা আমাদের ব্যাপকভাবে আকর্ষণ করে। বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় মানুষের সাম্প্রতিক চিন্তা-ভাবনা এবং ক্রমবর্ধমান জ্ঞানভিত্তিক আলোচনার চাহিদাকে সামনে রেখে জনাব জাহিদুর রহমানের তত্ত্বাবধানে আমরা এই সিরিজটিকে বাংলা ভাষায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করি।

এই আলোচনায় বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সৃষ্টির ইতিহাসের ওপর। প্রাথমিকভাবে সৃষ্টির ইতিহাস প্রসঙ্গে আমরা যা জানি এবং এর বাইরে আরও যেসব বার্তা আছে, সেগুলোও ধারাবাহিকভাবে আলোচনায় নিয়ে আসা হয়েছে। বিশেষ করে হাশরের দিন, হাশরের দিন সম্পর্কিত বিজ্ঞান, জান্নাত, জাহান্নামের মতো বিষয়গুলো খুবই চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টির ইতিহাসের ওপর আলোচনার মধ্য দিয়েই এই সিরিজটি শুরু হয়েছে। কীভাবে মানুষ, এই বিশাল পৃথিবী, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, ফেরেশতা, জিন, প্রাণিকুল সৃষ্টি হলো— সে প্রসঙ্গে শাইখ ওমর সুলেইমান অত্যন্ত প্রাণবন্ত আলোচনা করেছেন। এরপর তিনি আলোচনা করেছেন রাসূল ﷺ-এর জীবনী, জীবনের নানা অধ্যায় নিয়ে। একই সঙ্গে, রাসূলের ﷺ ওফাতপরবর্তী শতাব্দীগুলোতে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা; বিশেষত সেই শতাব্দীতে কী কী উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটল এবং ইসলামের ইতিহাস কীভাবে আবর্তিত হলো, সেই প্রসঙ্গেও আলোচনা করেছেন। তার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে খুবই সাবলীল ভাষায় বর্তমান সময়টাকেও আলোচনার শেষদিকে ধারণ করেছেন এবং এভাবেই গোটা সিরিজের সমাপ্তি টেনেছেন।

একটি বিষয় বলা দরকার— অতীতে ইসলাম বিশারদগণ এই ধরনের মৌলিক ইস্যুগুলোতে আলোচনা করতে গেলে অহেতুক বিতর্ক পরিহার করার চেষ্টা করতেন। পাশাপাশি কুরআনে উপস্থাপিত এই সব জরুরি বিষয়াবলি থেকে আমরা কতটা কল্যাণ, উপকার নিশ্চিত করতে পারি— সেদিকেই তারা বেশি মনোযোগ দিতেন। শাইখ ওমর সুলেইমানও একই নীতি অনুসরণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে লেকচার সিরিজ শুরু করার আগে সূচনা বক্তব্যে ওমর সুলেইমান বলেন—

‘অনেক ক্ষেত্রেই পূর্বসূরি ইসলামিক স্কলাররা আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়, এমন বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চাইলে কিছুটা সীমাবদ্ধতা বজায় রাখতেন। উদাহরণস্বরূপ, যখনই তারা আদম (আ.), লাওহে মাহফুজ বা এই ধরনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতেন, প্রথমেই উপকৃত হওয়ার সুযোগগুলোর দিকে মনোনিবেশ করতেন। তারপর মহাজাগতিক কোনো কিছু কিংবা ভিনগ্রহের প্রাণী সম্পর্কে হালকা একটু মন্তব্য করলেও বিস্তারিতভাবে কিছু বলতেন না। তারা বলার চেষ্টা করতেন— আমাদের কী করা উচিত। দৃষ্টিভঙ্গি এমন ছিল, আদৌ কোথাও যদি কোনো প্রাণী থেকে থাকে আর তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ না থাকে, তাহলে সেই বিষয় নিয়ে কথা বলে লাভ কী? এই যৌক্তিক ও সুনির্দিষ্ট আলোচনাটা ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের সুন্দর মানসিকতার একটি অনুপম নিদর্শন।’

এই লেকচার সিরিজেও ঠিক একই রকম চেতনা নিয়ে ওমর সুলেইমান আমাদের করণীয় ও দায়িত্ব নিয়েই বেশি আলোচনা করেছেন। আল্লাহ পবিত্র কুরআন এবং তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ-এর জীবন, কর্ম ও বচনের মাধ্যমে আমাদের যে জ্ঞান দিয়েছেন এবং এর পরবর্তী যুগে বিভিন্ন সময়ে বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিগণের কীর্তির মাধ্যমে যা জানতে পেরেছি, ওমর সুলেইমান সেগুলো ধারাবাহিকভাবে এই নাতিদীর্ঘ আলোচনায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

আশা করছি, বাংলা ভাষায় এই আলোচনাকে নিয়ে আসার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ সবাই ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করবেন। পাঠকরা এই আলোচনা থেকে নিজেদের মান উন্নয়নের জন্য যদি কোনো খোরাক খুঁজে পান, তা-ই হবে আমাদের সার্থকতা।

আলী আহমাদ মাবরুর

উত্তরা, ঢাকা

সূচিপত্র

সৃষ্টির ইতিহাস	১৩
সৃষ্টির শুরু	১৩
সীমাবদ্ধতা	১৭
সংশয়পূর্ণ ঈমান	২২
স্রষ্টা/সৃষ্টিকর্তা	২৮
আরশ	৩১
আরশের মালিক	৩৬
সম্মানজনকভাবে নাম উচ্চারণ	৩৮
আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠা	৪১
কলম ও ট্যাবলেট	৪৩
আল্লাহর ইচ্ছা	৪৬
ভাগ্য	৪৯
একজন সম্ভ্রষ্ট ঈমানদার	৪৯
ভাগ্য পরিবর্তন	৫৩
অন্যায় বা অনাচারের সৃষ্টি	৫৭
লেখনী অনেক বড়ো একটি নিয়ামত	৬১
আল্লাহর সৃষ্টি	৬৫
৬দিন, ৭টি আকাশ, ৭টি পৃথিবী	৬৫
আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া নিয়ামত	৬৮
চিন্তাশীল সৃষ্টি	৭২
তাদের ইবাদতগুলো আমরা বুঝতে পারি না	৭৫
সূর্য, চন্দ্র ও তারা	৭৯
পৃথিবীর বুকে জান্নাতের নদী	৮১
ফেরেশতা সমাচার	৮৪
ফেরেশতা	৮৪
ফেরেশতাদের নাম ও পদবী	৮৮
ভীতিকর চেহারার ফেরেশতাগণ	৯৩

তারা আপনার সাথে করমর্দন করবে	৯৯
আপনার ব্যাপারে ফেরেশতাগণ অবহিত করবেন	১০২
৭০ হাজার ফেরেশতা ঘেরাও করে নিয়ে যাবে	১০৫
অভিভাবক ফেরেশতাগণ	১০৯
ফেরেশতাদের কষ্ট	১১০
আপনার জন্য জান্নাত অপেক্ষমাণ	১১৪
জিন সমাচার	১১৭
জিন ও শয়তান	১১৭
জিনদের সাথে মিথস্ক্রিয়া	১২২
জিনদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া	১২৫
যেসব জিন আপনার ভাই	১২৯
জিন নবি	১৩৩
জিন ও ফেরেশতাদের মধ্যকার যুদ্ধ	১৩৫
পৃথিবীর উত্তরাধিকার	১৩৮
ডাইনোসর ও রোচেস	১৩৮
পৃথিবীর উত্তরাধিকারী	১৪২
হজরত আদমের সৃষ্টি	১৪৬
হজরত আদম (আ.)-এর শ্বাসপ্রশ্বাস	১৪৯
ফেরেশতাদের সিজদা	১৫১
আদম (আ.) তাঁর সন্তানদের সাথে সাক্ষাৎ	১৫৪
আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেছিলেন	১৫৭
যেখানে রুহগুলো একত্রিত হয়	১৬০
হজরত আদম (আ.)-এর জ্ঞান	১৬২
কুরআন কি সব সৃষ্টির আগেই লিখিত	১৬৫
শয়তান সমাচার	১৬৮
শয়তানের অহংকার	১৬৮
শয়তানের সব যুক্তি	১৭২
সিজদার যত উপকারিতা	১৭৫
শয়তান কি অবিশ্বাসী	১৭৯

শয়তানের দুআ	১৮১
আল্লাহ এখনও ক্ষমা করেন	১৮৪
আপনি আমার সাথে এমনটা করেছেন	১৮৮
অল্প কয়েকজনের মধ্যে शामिल করুন	১৯০
শয়তানের আত্মপ্রবঞ্চনা ও মানসিক সংকট	১৯২
অপচয় কাম্য নয়	১৯৫
আপনার নিশ্চিত শত্রু	১৯৮
শয়তানের চেয়েও শক্তিশালী	২০১
বেপরোয়া সব পদক্ষেপ	২০৪
নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করা	২০৭
শয়তানকে নিরস্ত্র করা	২০৯
আদম (আ.)-এর পরিণতি	২১২
জান্নাত থেকে নিষিদ্ধ হওয়া	২১২
বেহেশতেই হলো বিয়ে	২১৫
নারী আর পঁজড়ের হাড়	২১৭
দ্বৈত অবস্থান	২২১
প্রথম মিথ্যাচারের ইতিহাস	২২৪
আল্লাহ থেকে পালিয়ে বেড়ানো	২২৬
দ্বায় স্বীকার করে নেওয়া	২২৯
পাপকে পরাভূত করা	২৩৩
হজরত মুসা (আ.) এবং হজরত আদম (আ.)	২৩৫
পৃথিবী একটি বড়ো নিয়ামত	২৩৮

সৃষ্টির ইতিহাস

সৃষ্টির শুরু

জুবাইর বিন মুতিম رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলছেন- ‘ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে আমি ছিলাম নবিজির ﷺ সবচেয়ে বড়ো শত্রু। পৃথিবীতে তাকেই সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতাম। কিন্তু একদিন মসজিদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখনই রাসূল ﷺ সূরা আত-তুরের এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করছিলেন-

“তারা কি আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা? তারা কি নভোমণ্ডল নাকি ভূমণ্ডল- সৃষ্টি করতে পেরেছে? কিছুই না। এরপরও তারা বিশ্বাস করে না। তাদের সামনে আপনার পালনকর্তার সব প্রাচুর্য আর সম্পদ কি দৃশ্যমান, নাকি তারা নিজেরাই সেগুলোর নিয়ন্ত্রক?” সূরা আত-তুর : ৩৫-৩৭

জুবাইর رضي الله عنه যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে আরও কিছুটা সময় পর ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি বলেন- ‘যখনই আমি এই আয়াতটা রাসূল ﷺ-কে তিলাওয়াত করতে শুনেছিলাম, আমার অন্তরে ঠিক সেই মুহূর্তেই ঈমানের চেতনা শক্তভাবে গেঁথে যায়। আমি অনুধাবন করি, একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছেন। আর তখনই আল্লাহ তায়ালাকে চিনতে পারি এবং ঈমান আনি।’ এই হাদিসটি সহিহ আল বুখারিতে পাওয়া যায়।

প্রকৃত বাস্তবতা এমনই। কখনো যদি সৃষ্টির ইতিহাস নিয়ে একটু ভাবেন- কীভাবে সৃষ্টি হলো কিংবা কীভাবে দুনিয়ায় এলাম; এগুলো নিয়ে বিজ্ঞানের নানা বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করেন, তাহলে এ বিষয়ে আল্লাহ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আমাদের তাঁর কাছেই ফিরে আসতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই।

আল্লাহ তায়ালা নিজেও পবিত্র কুরআনে এই সত্যটাই তুলে ধরেছেন-

‘(হে নবি আপনি) বলুন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা করো, তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি পৃথিবীতে এমন কিছু দেখাতে পারবে যা তারা সৃষ্টি করেছে? অথবা নভোমণ্ডল সৃষ্টিতে কি তাদের কোনো অবদান আছে? তোমরা যদি সত্যবাদী হও, যদি তোমাদের সংসাহস থাকে তাহলে তোমরা তোমাদের দাবির সপক্ষে ইতঃপূর্বে নাজিল হওয়া কোনো কিতাব বা উত্তরাধিকার সূত্রে জানার মতো উদাহরণ হাজির করো। সূরা আহকুফ : ৪

এখানে কুরআন ও হাদিসের একটা দৃষ্টিভঙ্গি বেশ লক্ষণীয়। এখানে এমন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে আরও কাউকে শরিক করে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে— রাসূলের ﷺ সমসাময়িক যুগে নাস্তিকতা বিস্তৃতি লাভ না করায় এই আয়াতগুলোতে তাদের বিবেচনায় নেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। কোনো সৃষ্টিকর্তা-ই নেই— এই চিন্তা অনেক বেশি অমূলক ও অপ্রাসঙ্গিক। কারণ, যারা একাধিক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করত, তাদের অবস্থান অন্তত এতটুকু ছিল— যেনতেন হলেও পৃথিবী সৃষ্টির পেছনে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারত। কিন্তু নাস্তিকেরা এসব আলোচনা থেকে বহু দূরে!

এ কারণেই আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করে উপরোক্ত আয়াতে বলেছেন— আমাকে এমন কিছু দেখাও যা এই পৃথিবীতে তারা (আল্লাহর সাথে কথিত শরীকেরা) সৃষ্টি করেছে। এখানে আল্লাহ আকাশমণ্ডল বা অদেখা অন্য সৃষ্টির কথা বলেই থেমে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি পার্থিব সৃষ্টির কথাও বলেছেন। জ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবী হলো তাঁর চ্যালেঞ্জের মূল উপজীব্য। কারণ, আমরা পৃথিবীটা চাক্ষুষ দেখতে পারছি। তাই পৃথিবীর যেকোনো সৃষ্টি দিয়ে চ্যালেঞ্জ করাটাই বেশি গ্রহণযোগ্য হবে।

আল্লাহ উদাহরণ হিসেবে পৃথিবীতে দৃশ্যমান পাহাড়-পর্বত, খনিজ উপাদান বা সাগর-নদীর কথাই তুলে ধরেছেন। কেউ যদি দাবিও করে— আমি তো ঘর বানিয়েছি কিংবা অমুক জিনিস তৈরি করেছি, তবে সেই কথাটিও অবান্তর। আল্লাহ অনুমোদন ছাড়া তা কখনো সম্ভব হতো না। কারণ, যে কাঁচামাল বা উপকরণ দিয়ে বস্তুটি বানানো হয়েছে, তা আল্লাহ তায়ালাই সরবরাহ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ যদি আকাশ থেকে বৃষ্টি না ঝরাতেন, তাহলে কীভাবে ফসল উৎপাদন করতাম?

এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে দৃশ্যমান সৃষ্টির কর্তৃত্ব নিয়েই কথা বলেছেন। কারণ, যা দৃশ্যমান তাঁর কর্তৃত্ব বা সৃষ্টির ক্ষমতাই যদি মুশরিকদের কথিত সৃষ্টিকর্তার না থাকে, তাহলে মানুষ যা দেখতে পারে না অথবা যে বিষয় সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই, তা কীভাবে সৃষ্টি করবে? তা ছাড়া মানুষের সাথে এমন কোনো সত্তারও যোগাযোগ নেই, যা কিনা এই অদেখা ভুবনের সৃষ্টি সম্পর্কে তথ্য জানাতে পারবে!

আল্লাহ রাক্বুল আলামিন সংশয়বাদীদের আস্থায় নেওয়ার জন্যই পার্থিব বিষয়াবলি নিয়ে বেশি আলোচনা করেছেন। বিষয়গুলো চাক্ষুষ হওয়ায় এ সংক্রান্ত আলোচনা মানুষের কাছে বেশি যৌক্তিক মনে হবে।

ওপরের আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ প্রমাণাদি প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন— তাদের দাবিগুলো তখনই যৌক্তিক হবে, যখন এর সপক্ষে প্রমাণ দিতে পারবে। কারণ, তাদের হাতে কোনো যৌক্তিক প্রমাণও নেই, বুদ্ধিবৃত্তিক নজিরও নেই।

সাম্প্রতি আমি নাস্তিক ঘরানার কিছু ভিডিও দেখেছি। তারা বিভিন্ন ঘটনা প্রসঙ্গে আলোচনা করে। বিন্ধিষ্ট এসব ঘটনাগুলো একসঙ্গে করে পরিশেষে একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দাবি করে— এটাই নাকি

নাস্তিকতার বিশ্লেষণ। এই ভিডিওগুলো দেখে আমার সেই বিতর্কের কথা মনে পড়ে যায়, যেখানে ইমাম আবু হানিফা আদ-দাহিরিয়া নামক একটি সম্প্রদায়ের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন।

দাহিরিয়া শব্দের অর্থ সময়পন্থি। তারা একটি বস্তুবাদী চিন্তাসম্পন্ন দল যারা মনে করে— ‘যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তা সবই সময়ের খেলা। আদৌত কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই; সময়ই স্রষ্টা। সময়কে কেউ সৃষ্টি করেনি। কেউ চলে যাওয়ার পরই তার অবসান ঘটে ইত্যাদি।’

এই দাহিরিয়া গ্রুপটিই একবার ইমাম আবু হানিফাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। সেই চ্যালেঞ্জের অংশ হিসেবে তারা আবু হানিফার সঙ্গে বিতর্কে অংশ নেয়। ইমাম আবু হানিফাও তাদের চিন্তাধারা সম্বন্ধে ভালোভাবেই জানতেন। তাই তিনিও সানন্দে বিতর্কে অংশ নিতে রাজি হন।

যাহোক, দাহিরিয়া সম্প্রদায় বিতর্ক করার জন্য নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হলো। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা আসতে দেরি করছিলেন। তখন লোকজন বলাবলি করছিল, ইমাম হয়তো ভয় পেয়েই আসতে দেরি করছেন! তিনি হয়তো হেরে যাওয়ার ভয়ে না আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইত্যাদি।

অবশেষে এক ঘণ্টা পর ইমাম আবু হানিফা হাজির হলেন। তাঁর বিলম্ব দেখে দাহিরিয়া সম্প্রদায়ের নেতারা বলল— ‘দেরি দেখেই বুঝতে পেরেছি, আদৌত আমাদের সামনে উপস্থাপন করার মতো কোনো যুক্তি আপনার নেই।’

ইমাম আবু হানিফা জবাবে বললেন— ‘আগে তো আমাকে দেরি করার কারণটা বলতে দিন।’

দাহিরিয়া সম্প্রদায়ের নেতারা সম্মতি দিলে তিনি বললেন— ‘আমাকে একটা নদী পার হয়ে আসতে হয়। নদী পার হতে তো নৌকার প্রয়োজন, কিন্তু নদীর তীরে এসে কোনো নৌকা পেলাম না। তাই অপেক্ষা করতে লাগলাম— যদি প্রকৃতি নদী পার হওয়ার মতো একটি ভেলা বা নৌকা তৈরি করে দেয়। আমি অপেক্ষায় ছিলাম কয়েক টুকরা কাঠের, যেগুলোকে বাতাস এক জায়গায় নিয়ে আসবে। তারপর তারা জোড়া লেগে নৌকার পাটাতন তৈরি হবে। হলোও তাই। কিন্তু তার জন্য তো সময় লাগে। তাই এখানে আসতে ঘণ্টাখানেক দেরি হলো।’

এ গল্প শুনে দাহিরিয়া সম্প্রদায়ের নেতারা প্রচণ্ড বিরক্ত হলো। তারা বলল— ‘আপনি আমাদের এমন অবাস্তব গল্প বিশ্বাস করতে বলছেন?’

ইমাম আবু হানিফা বললেন— ‘আপনারাই আমাকে এভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করেছেন। আপনারাই তো বলছেন, এই বিশাল পৃথিবী আর এর সকল সৃষ্টি শূন্য থেকেই এসেছে। সময়ের বিবর্তনে সব একা একাই সৃষ্টি হয়েছে। অথচ সেই আপনারাই সামান্য একটা নৌকা সৃষ্টির গল্প শুনেই অবিশ্বাস করছেন?’

এভাবেই ইমাম আবু হানিফা নাস্তিকদের যুক্তিকে অসাড় প্রমাণ করেছিলেন।

এসব সংশয়বাদী কথাবার্তা যারা বলে, তাদের কারও কারও মত হলো— এই বিশ্বজগৎ কেউ সৃষ্টি করেনি। আরেকটি মতামতও পাওয়া যায়, এগুলো সৃষ্টির পর এসব কেউ বিন্যস্ত করেনি। এই বিশ্বজগৎ আপনা-আপনিই অপরূপ রূপে সেজেছে। আসলে এই ভাবনাগুলো বেশ জটিল এবং একই সঙ্গে অযৌক্তিক। এগুলো মানতেও কষ্ট হয়।

তাই ইমাম আবু হানিফা বিষয়টা খুব সরলভাবেই মোকাবিলা করেছিলেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন— ‘এই পৃথিবীতে আগমনের বিষয়টি যদি বিবেচনায় নিতেই হয়, তাহলে তোমাদের আগমনের পূর্বের প্রেক্ষাপটও বিবেচনায় আনতে হবে। তোমাকে মানতে হবে, তোমার পূর্বপুরুষ বলেও কেউ ছিল।’

এটা অবশ্য আমরা সকলেই মানি। আমরা যদিও পূর্বপুরুষদের স্বচোখে দেখিনি, তারপরও মেনে নেই। কারণ, এই প্রক্রিয়াটি দৃশ্যমান।

পৃথিবীকে সুবিন্যস্ত করে সাজানোর বিষয়টি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) আরও চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একবার এক নাস্তিক ইমাম শাফেয়িকে প্রশ্ন করেছিল— ‘আপনি কীভাবে জানেন একজন সৃষ্টিকর্তা আছে?’

জবাবে ইমাম বলেছিলেন— ‘তুন্তগাছ দেখে।’

নাস্তিক বিস্মিত হলো— ‘সামান্য তুন্তগাছ দেখে?’

ইমাম বললেন— ‘হ্যাঁ। দেখ, এই গাছের পাতাগুলোর একই স্বাদ, একই রং, একই রকম ঘ্রাণ; আবার দেখতেও একই রকম। যখন কেউ এই গাছ থেকে বিষ নিতে চাচ্ছে, তখন সে বিষই পাচ্ছে। আবার যখন মৌমাছি চুষে নিচ্ছে, সে মধুর স্বাদ পাচ্ছে। আবার যখন মেষ খাচ্ছে, তখন সে দুধ পাচ্ছে। আবার এই গাছ থেকে কস্তুরিও পাচ্ছে। সামান্য একটি গাছ অথচ গঠন ও উৎপাদনের দিক থেকে কতটা বৈচিত্র্যময়! এসব বৈচিত্র্যতা আল্লাহ ছাড়া কারও সৃষ্টি হতেই পারে না।’

এরপরই ইমাম শাফেয়ি (রহ.) সূরা আল মুমিনুনের সেই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, যেখানে বলা হয়েছে— সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, যিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা।

চিন্তা করুন, ভালো লাগবে। সামান্য একটা গাছের পাতা থেকে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) কত অপূর্ব দর্শন উপস্থাপন করেছিলেন। মূলত এটাই সত্য, আমরা চারপাশে যে আলৌকিক বিষয়গুলো অহরহ দেখতে পাচ্ছি, তা কখনোই উত্তম কোনো নকশাকারীর নকশা ছাড়া সম্ভব ছিল না। তাই কজ অ্যান্ড ইফেক্ট তত্ত্ব দিয়েও যদি বুঝতে চান— তারপরও আপনাকে মানতে হবে, একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন; তাকে সরাসরি দেখার প্রয়োজন নেই। এমনকী তাঁর শারীরিক অবয়ব বোঝারও দরকার নেই।

যখন আপনি এতটুকু মেনে নেবেন- তারপর বিবেচনা করুন এই নকশা, পৃথিবীর এই বিন্যাস কত চমকপ্রদ ও সুন্দর! যখন ইতিবাচকভাবে পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করবেন, তখন সার্বিক এই দৃশ্যপটটিই নিশ্চিত করবে- একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছেন। সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কোনো কিছুই সৃষ্টি হয় না।

এই চরম সত্যটি অস্বীকার করলে- মানুষ সৃষ্টি, চারপাশের এত সব রং, মনকাড়া সৃষ্টি উপকরণ, কোনো কিছু সৃষ্টিরই গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না; যাবেও না।

সীমাবদ্ধতা

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের একবারে শুরুর দিকে যেভাবে বক্তব্য দেওয়া শুরু করেছেন, তা হলো-

‘আলিফ লাম মিম। এ সেই কিতাব যাতে বর্ণিত কোনো কিছু নিয়েই সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেজগারদের জন্য, যারা অদেখা বিষয়ের ওপর বিশ্বাস রাখে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদের যে রিজিক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে এবং ইতঃপূর্বে তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে- তার ওপর যারা বিশ্বাস এনেছে। আর আখিরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।’ সূরা বাকারা : ১-৪

এখানে আল্লাহ ঈমানদারদের সংজ্ঞায় বলেছেন- ঈমানদার হলো তারা, যারা অদেখা জিনিসের ওপর বিশ্বাস আনে। অর্থাৎ যারা এভাবে ভাবে, কোনো কিছু বিশ্বাস করতে হলে আগে তা দেখা জরুরি- আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে সেই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বরং জানাচ্ছেন- আমরা (মানুষ) এমন এক জায়গায় এসে পড়েছি, যেখানে অনেক কিছুই দেখছি বা জানছি, কিন্তু তা আমাদের পক্ষে অনুভব বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই আমরা যখন অন্তর থেকে বিশ্বাস করে একমত হব- সবকিছু আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। আমাদের যা কিছু অজানা, তা কেবল আল্লাহ জানেন, তখনই প্রকৃত সম্ভৃষ্টি খুঁজে পাব।

আর ঠিক এ জায়গাতেই অহংকারের বিষয়টি চলে আসে। আমরা সকলেই নবিজির ﷺ অত্যন্ত জনপ্রিয় সেই হাদিসটি জানি-

‘আদম সন্তানের মনে এক অণু পরিমাণ অহংকার থাকলেও তা নিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।’ সাহাবিরা যখন প্রথমবার এই হাদিসটি শুনলেন, তারা বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তারা অহংকারের মাত্রা বা ধরনটি সম্পর্কে পরিষ্কার হতেও পারছিলেন না। তাই তারা রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলেন- ‘হে আল্লাহর রাসূল, তাহলে কেউ যদি সুন্দর কোনো পোশাক পরে বা ভালো কোনো জুতা পরে, তাও কি অহংকার হিসেবে গণ্য হবে?’

জবাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছিলেন- ‘না তা অহংকার নয়। অহংকার হলো দুটো জিনিস। এক. নিজেকে বড়ো প্রমাণ করতে গিয়ে অপরকে ছোটো করা। দুই. আইন বা বিধিবিধান অমান্য করা।’

তাই যখন বলি আল্লাহ্ আকবার- এই শব্দদ্বারা আসলে আমরা আল্লাহকেই অন্য সবকিছুর চেয়ে বড়ো বলে মেনে নিই। প্রকারান্তরে, অহংকার বিষয়টির জন্ম হয় যখন নিজেদের বড়ো করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি। যখনই নিজেদের বাড়তি মূল্যায়ন করি, তখনই আল্লাহর ওপর অবিচার করা হয়। আর কিয়ামতের দিন এই অবিচার বড়ো আকারের অপরাধ হিসেবেই বিবেচিত হবে।

ইমাম আব্দুল কাইয়ুম (রহ.) রাসূল ﷺ উপরোক্ত হাদিস প্রসঙ্গে বলেন-

‘অপরকে ছোটো করা বা আল্লাহর দেওয়া বিধান লঙ্ঘন করার অপরাধে জাহান্নামকে শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ, কাউকে মূল্যায়ন এবং আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা দুটো একমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। তাই যদি কেউ অন্যকে মূল্যায়ন করার দায়িত্ব নেয় কিংবা নিজেকে আইন বানানো বা আইন লঙ্ঘন করার মতো ক্ষমতাবান হিসেবে ভাবতে শুরু করে, তাহলে সে প্রকারান্তরে নিজেকে সৃষ্টিকর্তার জায়গায় নিয়ে যায়। এমনকী কেউ যদি অন্য কারও দৃশ্যমান বা বাহ্যিক কোনো কিছু দেখে তাকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করে, তারপরও সে নিজেকে সৃষ্টিকর্তার স্থানে প্রতিস্থাপন করে ফেলল। এভাবেই ব্যক্তির মনে অহংকারের জন্ম হয়। নিজেকে আপন যোগ্যতার চেয়েও অনেক বড়ো শুরু করে।’

হজরত আবু বকর সিদ্দিক ؓ খলিফা হওয়ার পর যখন পারস্যের রাজা কিসরাকে পাঠানো চিঠিতে খুব চমৎকার কিছু বার্তা দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন- ‘তুমি কি নিজেকে আল্লাহর সাথে তুলনা করার মতো অহংকার করছ? তাহলে দুটো জিনিস একটু ভেবে দেখ। প্রথমত, তুমি আসলে কে? আর কী থেকে তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।’

মহান আল্লাহ কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলেন-

‘আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির পর অন্য অনেক সৃষ্টির মতো শুরুতেই মানুষকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। অথচ মানুষ কতটা অকৃতজ্ঞ। কোথা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে নোংরা বীর্যের একটি ফোঁটা থেকে। আল্লাহই তাঁর ইচ্ছানুসারে মানুষকে সৃষ্টি ও বিকশিত করেছেন।’

তাই মানুষের সৃষ্টি বা সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমার আপনার কিছুই বলার নেই। অথচ মহান আল্লাহ আমাদের সুবিধার জন্য সবকিছু, এমনকী চলার পথও সহজ করে দিয়েছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলছেন—

‘এই সরল বলতে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই সহজতাকে বোঝানো হয়েছে। যেমন : আল্লাহ এই পৃথিবীতে আমাদের প্রবেশের প্রক্রিয়াটি সহজ রেখেছেন। আমরা মায়ের ঔরশ থেকে দুনিয়াতে আসি; এটা শারীরিক সহজতা। আবার আধ্যাত্মিকভাবেও যদি চিন্তা করি— আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে চলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন।’

একজন মানুষ দুনিয়াতে আসার পর কখন বিদায় নেবে, সেই মুহূর্তটিও আল্লাহই নির্ধারণ করেন। আল্লাহই মানুষকে মায়ের অন্ধকার গর্ভ থেকে এই পৃথিবীতে, আলোর মাঝে নিয়ে আসেন। আবার তিনিই দুনিয়ার জীবন শেষে তাকে পৃথিবীর গর্ভে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ফিরিয়ে নেন। এককথায়— এই পৃথিবীতে আসা বা যাওয়ার ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। তাহলে আমরা কোন কারণে এত অহংকার করি?

আল্লাহ এ বিষয়ে কুরআন বলেছেন—

‘মানুষ তার নির্ধারিত সময়ের (জীবনের মেয়াদ) আগে ও পরের কোনো পরিণতি জানে না।’

ধরা যাক, মানুষ যখন থেকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পায়, তার আগের কোনো কিছুই সে জানে না। যে বীর্ষ থেকে তার সৃষ্টি— এর আগে তার অবস্থান কোথায় ছিল, সে সম্পর্কেও মানুষ কিছুই জানে না। সে কারণেই আমরা যা দেখব তা-ই শুধু বিশ্বাস করব, আর যা দেখব না-বা জ্ঞান ও যোগ্যতা দিয়ে নিরূপণ করতে পারব না, তা বিশ্বাস করব না— এই চিন্তা সম্পূর্ণ অমূলক।

এ ক্ষেত্রে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল। কয়েকদিন আগে একটি চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিলাম। সাধারণত এমন স্থানে গেলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা তাদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে খুব একটা মতামত শুনি না। কারণ, আমি নিজে ঘুরে পুরো স্থানটি উপভোগ করি এবং প্রত্যেকটি প্রাণীর সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত হই।

কিন্তু সর্বশেষ যেবার চিড়িয়াখানায় গেলাম, চিড়িয়াখানার এক কর্মকর্তা ইগলের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন— ‘ইগলের দেখার ক্ষমতা একজন সুস্থ মানুষের চেয়ে চারগুণ বেশি, সুবহানআল্লাহ!’

তিনি এই চারগুণ বেশি দৃষ্টিক্ষমতার ব্যাখ্যায় বললেন— ‘যদি একটি ফুটবলের গোল পোস্টে পত্রিকা ঝুলিয়ে রাখা হয়, তাহলে তিনটি ফুটবল মাঠ পেরিয়ে যাওয়ার পর যে দূরত্ব হয়, সেখান থেকেও ইগল পাখি পত্রিকার লেখা দেখতে পারে।’

একইভাবে একটি হাঙর প্রায় ২০ গ্যালন পরিমাণ পানির নিচে পড়ে থাকা রক্তের ফোঁটা দেখতে পারে। তিন মাইল দূর থেকে হাঙর সেই রক্তের দ্রাণ পায়। আবার হাতি তিন মাইল দূরে থাকা পানির দ্রাণ পায়। হামিংবার্ড— পৃথিবীর সবচেয়ে ছোটো পাখিটিও সেকেন্ডে ৮০ বার ডানা ঝাপটাতে পারে। একটা মাছিও তার উচ্চতার ২০০ গুণ ওপর দিয়ে লাফ দিতে পারে।

একটি চিতা ৩ সেকেন্ডে শূন্য থেকে ৬০ মাইল গতিতে দৌড়ানোর গতি বৃদ্ধি করতে পারে। একটি জিরাফ জন্মের মাত্র আধা ঘণ্টা পর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এসব তথ্য প্রমাণ করে— শারীরিক কাঠামোগত দিক থেকে আমরা সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নই; যদিও অনেকেই জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তা মনে করে।

ইমাম সুফিয়ান সাওরি (রহ.) এ প্রসঙ্গে চমৎকার একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেন— ‘মানুষ সকল প্রাণীর চেয়ে একটি দিকেই এগিয়ে আছি তা হলো— আমরা আল্লাহকে সিজদা দিতে পারি।’ অর্থাৎ মানুষ সিজদা দেওয়ার সময় শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নত করতে পারে। এই সিজদা দেওয়ার জন্যই আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আর এটার জন্যই আমরা সকল সৃষ্টির সেরা।

আমরা আসলে সব দিক থেকেই সীমিত অবস্থায় আছি। চারপাশে যা ঘটে, তার খুব সামান্যই ধারণা ও বিশ্লেষণ করতে পারি। যেমন : আমরা জানি, মহাকাশে কয়েক বিলিয়ন তারকা আছে। বিজ্ঞানীরাও এখন বলছেন, গ্যালাক্সিতেই তিনশো বিলিয়নেরও অধিক তারকা আছে। কেবল আমাদের মহাকাশেই ট্রিলিয়নের ওপর গ্রহ আছে। আর আমাদের গ্যালাক্সির বাইরেও অসংখ্য গ্যালাক্সি আছে। মহাকাশে কত বিপুলসংখ্যক গ্রহ ও তারকা ঘুরে বেড়াচ্ছে, যা আমরা দেখতেও পাই না।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে যে বিপুলসংখ্যক গ্যালাক্সি আছে, সেগুলো পরস্পরের ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। যেমন : প্যারিস থেকে উড্ডয়নরত একটি বিমানের সাথে ওয়াশিংটন থেকে আরোহণ করা বিমানের সংঘর্ষের সম্ভাবনা খুবই কম। তাহলে বোঝা যায়— যে মহাকাশে শত বিলিয়ন গ্যালাক্সি প্রতিমুহূর্তে ছুটে বেড়াচ্ছে, সেই মহাকাশ আকৃতিতে কতটা বিশাল!

আমরা এখন জানি— বিপুলসংখ্যক তারা, গ্রহ, নক্ষত্র ও গ্যালাক্সি আছে, কিন্তু কখনো তা দেখার সুযোগ পাই না। আর যখনই বিগব্যাং তত্ত্ব বা অন্যান্য সব প্রচলিত তত্ত্ব নিয়ে কথা বলবেন, বিজ্ঞানীরাই স্বীকার করছেন— যদি এক সেকেন্ডেরও শত সহস্র ভাগের এক ভাগের জন্যও সময় থেমে যায় অথবা কোনো কারণে স্থগিত হয়, তাহলে এসব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। ভেবে দেখুন, এত বিশাল মহাকাশ, বিশ্বজগৎ, শত-সহস্র তারকারাজি— একজন সৃষ্টিকর্তা যদি না থাকেন, তাহলে এগুলো কীভাবে এত সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে?

এরপর চিন্তা করুন, আমরা কীভাবে বেঁচে আছি। বিজ্ঞান বলছে, পৃথিবীতে মানুষসহ প্রাণিকুলের বেঁচে থাকার জন্য দুই শতাধিক প্যারামিটার আছে, যা সঠিক পরিমাণে ও সমানুপাতে থাকলেই গোটা প্রাণিজগৎ টিকে থাকবে। যদি কোনো সৃষ্টিকর্তা এগুলোকে সুন্দর করে নিয়ন্ত্রণ না করতেন, তাহলে কি আমাদের অস্তিত্ব থাকত?

সাম্প্রতিক সময়ে আমি একটা কলাম পড়েছি, যাতে বলা হচ্ছে— বিজ্ঞান এখন নতুন নতুন যেসব তথ্য আবিষ্কার করছে, তাতে একজন সৃষ্টিকর্তা কিংবা একজন সুবিন্যাস্তকারীর অবস্থান সম্পর্কে আরও বেশি নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জন লেনক্স সম্প্রতি স্বীকার করেছেন, আমরা যত বেশি বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানতে পারব, তত বেশি এই ধারণাটি পাকাপোক্ত হবে যে, সৃষ্টিকর্তা বলে একজন সত্যিই আছেন। আর তিনি আছেন বলেই আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি এবং ভালোভাবে বেঁচে আছি।

তাই আমাদের অবশ্যই মানতে হবে, সৃষ্টিকর্তা বলে একজন আছেন। তিনি আমাদের পরিচিত সময় জ্ঞানের বাইরে, চেনা-ভাবনার বাইরের কোনো সত্তা। তিনি কারণ ও প্রভাব (কজ অ্যান্ড ইফেক্ট) তত্ত্বের পরিধির বাইরে। তিনি নিজেই নিজের মতো করে অস্তিত্ব বজায় রাখেন, আর তার ইচ্ছাতেই এই বিশাল বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। আর মহান সেই সত্তাই হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

সংশয়পূর্ণ ঈমান

প্রায় এমন হয়— যখন কোথাও যাই, কিছু মানুষ আমার সঙ্গে একটু একান্তে কথা বলতে চায়। তারা বলে— দেখুন, আমি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখি। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে আমার মধ্যে নানান চিন্তা আসে। জানি না, আমার ঈমান ঠিক আছে কি না! এ অপরাধে আল্লাহ আমাকে কতটা শাস্তি দেবেন, তাও জানি না। কারণ, আমার মধ্যে কিছু সন্দেহ জন্মেছে!

রাসূল ﷺ এই সমস্যার একটি সহজ সমাধান দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর দুটি হাদিস আছে, দুটোই সহিহ আল মুসলিমে রয়েছে। তিনি বলেছেন—

‘কিছু মানুষ হয়তো এক জায়গায় বসে কিছু আলাপ-আলোচনা করছে। তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়েই কথা বলছে। আল্লাহ এটা সৃষ্টি করেছেন, ওটা সৃষ্টি করেছেন— এগুলোই বলছে। তখনই হঠাৎ করে সেই আলোচনার মধ্যেই কেউ হয়তো কথাটা তুলছে, তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?’

অপর হাদিসটিতেও রাসূল ﷺ বলেছেন—

‘একজন মানুষ হয়তো অনেকক্ষণ যাবৎ আল্লাহর সৃষ্টিকুল নিয়ে ভাবছে। অমুক জিনিসটা কে সৃষ্টি করেছে? আর নিজেই উত্তর দিচ্ছে— আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ঠিক তখনই শয়তান সেখানে চলে আসে, তার মাথায় চিন্তা ঢুকিয়ে দেয়, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?’

উপরোক্ত দুটি হাদিসেই রাসূল ﷺ আমাদের একটি টিপস দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

‘যখনই তোমাদের কারও মধ্যে এই ধরনের চিন্তা চলে আসবে, তখনই তোমরা বলবে, আমানতু বিল্লাহ। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন তুমি শয়তানের প্ররোচনাকে ঝেড়ে ফেলতে পারবে, ঠিক একইভাবে নিজের ঈমানটাকেও আবার ঝালাই করে নিতে পারবে।’

এখন যদি প্রশ্ন করেন, আপনার মনে এই প্রশ্নটি আসার জন্য আল্লাহ কোনো শাস্তি দেবেন কি না? আমি বলব- না, কখনোই না।

এখানে আমরা একটা চমৎকার কথোপকথনের রেফারেন্স উল্লেখ করতে পারি। এটা কথোপকথন হয়েছিল দুই প্রসিদ্ধ সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. ও আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা.-এর মাঝে। হজরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-কে প্রশ্ন করেছিলেন- ‘কুরআন শরিফে আপনার প্রিয় আয়াত কোনটি, যা গোটা উম্মাহকে নানা ধরনের সংশয়ের সময় আশাবাদী করতে পারে?’

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. উলটো জানতে চাইলেন- ‘আপনার কোনটি?’

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. উত্তর দিলেন-

‘হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’
সূরা জুমার : ৫৩

আপনারা যদি কেউ হজরত ইবনে আমর বিন আস রা.-এর জীবন নিয়ে পর্যালোচনা করেন- দেখবেন, তিনি প্রায়শই হতাশায় ডুবে থাকতেন। কিন্তু এই আয়াত পড়েই আশাবাদী হয়েছিলেন। এ আয়াত অনেককেই আশাবাদী করবে। কারণ, এখানে ঘোষণা করা হয়েছে- আল্লাহ সকল গুনাহ-ই মাফ করে দিতে পারেন।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. এবার বললেন- ‘আমাকে যে আয়াতটি প্রবলভাবে আশাবাদী করে তা হলো- সূরা বাকারার ২৫৮ নং আয়াত- যেখানে ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়ে নমরুদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন।’

‘ইবরাহিম যখন বললেন, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে (নমরুদ) বলল, আমি জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহিম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি পারলে সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করো। তখন সেই কাফির হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না।’ সূরা বাকারার : ২৫৮

নমরুদের হতভম্ব হওয়ার কারণ- তার কাছে মানুষকে জীবন দেওয়া বা নেওয়ার ধারণাটাই স্পষ্ট ছিল না। সে একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়ে মনে করেছে- কাউকে জীবন দিয়েছে। আবার নিরীহ একজন মানুষকে হুট করে হত্যা করেই মনে করেছে- সে মৃত্যু দেওয়ার মালিক।

নমরুদের এই ভ্রান্ত ধারণার বিপরীতে ইবরাহিম (আ.) একটি যৌক্তিক বিতর্ক সামনে নিয়ে আসেন। তিনি বোঝাতে সক্ষম হন, আমরা জীবন দেওয়া বা নেওয়া প্রসঙ্গে যা বুঝি তা সঠিক নয়; বরং আল্লাহ প্রকৃতার্থেই মানুষকে জীবন দিতে পারেন আবার মৃত্যুও দিতে পারেন। আর এর পরপরই ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর ক্ষমতার উদাহরণ দিতে গিয়ে পূর্ব থেকে সূর্য উঠানোর প্রসঙ্গটি নিয়ে আসেন। কারণ, সূর্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টা মানুষের হাতে একবারেই নেই।

যৌক্তিকভাবে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার পরও ইবরাহিম (আ.) আল্লাহকে বলেন— ‘আপনি যে জীবন দান করেন বা নেন, তার প্রমাণ দেখান।’ এই ঘটনাটি আছে একই সূরার পরের আয়াতেই—

‘যখন ইবরাহিম বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখাও কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন; তুমি কি বিশ্বাস করো না? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এ জন্য চাইছি, যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখি ধরে নাও। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের ওপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক; তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন।’ সূরা বাকারা : ২৬০

খেয়াল করে দেখুন, দৃঢ় ঈমান থাকার পরও হজরত ইবরাহিম (আ.) অন্তরে একটু শান্তি পাওয়ার জন্য প্রমাণ দেখতে চাইলেন। আর আল্লাহ রাক্বুল আলামিনও তাঁর সেই চাওয়ার প্রতি শ্রদ্ধা দেখালেন।

চিন্তা করুন, কেন ইবনে আব্বাস রাঃ এই আয়াতটিকে সবচেয়ে পছন্দের তালিকায় রাখলেন? কেনই-বা বললেন, এই আয়াত তাকে অনেক বেশি আশাবাদী করে। কারণ, এই আয়াতের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে রাসূল সঃ বলেছেন— ‘আমাদেরও হজরত ইবরাহিমের মতো সন্দেহ করার অধিকার আছে।’

এখন রাসূলের সঃ এই উক্তি কি প্রমাণ করে, ইবরাহিম (আ.) আল্লাহকে নিয়ে কোনো ধরনের সংশয়ের মধ্যে পড়েছিলেন?

অবশ্যই না। কারণ, ইবরাহিম (আ.) নিজেই বলেছিলেন— ‘আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু প্রমাণ দেখতে পারলে আমার অন্তরে ঈমান আরও গোঁথে বসবে বা ঈমান মজবুত হবে।’ তাই রাসূল সঃ উম্মতকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

‘যেহেতু ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর কাছে প্রমাণ দেখার জন্য আবদার করেছিলেন, আর সেটা তিনি করেছিলেন অন্তরে শান্তি পাওয়ার জন্যই। তাই মানুষ হিসেবে আমরাও কখনো কখনো বিশেষত যখন মনে নানা ধরনের সংশয় প্রবেশ করে, তখন মনের প্রশান্তির জন্য প্রণোদনামূলক কিছু খুঁজতেই পারি। আর ওই সংশয়টুকু মনে আসার জন্য আল্লাহ আমাদের শান্তি দেবেন না। কিংবা মনে মনে আমরা যে কথা বলি, তার জন্যও আল্লাহ আমাদের পাকড়াও করবেন না।

রাসূল ﷺ তাঁর উম্মতকে স্বস্তি দিতে গিয়ে এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন—

‘মানুষের মনে যেসব চিন্তা, সংশয় আসে— তার জন্য আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন না, যতক্ষণ না সে তার সংশয়ের আলোকে কোনো কথা না বলে কিংবা কাজ না করে। কেননা, এসব সংশয় মূলত শয়তানেরই ওয়াসওয়াসা। শয়তান মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য তার মনে এই ধরনের সংশয় বা কুচিন্তা প্রবেশ করিয়ে দেয়।’

এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে, শরিয়তের সকল বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলেই কি হজরত ইবরাহিম (আ.)-কে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারব? না, তাও কিন্তু নয়।

ইসলাম প্রমাণ নয়; বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি সুন্দর পরিসমাপ্তিতে পৌঁছানোর জন্য নিজের আকল বা মেধাকে ব্যবহার করার তাগিদ দিয়েছে।

যেমন, ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি ও মানি— আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যে তথ্যটি এসেছে তা শতভাগ সঠিক। যদি আমার যুক্তিতে এই যুক্তির সাথে একমত হতে না-ও পারি, তারপরও বিশ্বাস করি— তাদের কথাই সঠিক। এরপর যদি তাদের কথার সপক্ষে কোনো প্রমাণ পাই, তাহলে আমার বিশ্বাস আরও পাকাপোক্ত হয়।

এ কারণে যখন আল্লাহর বাণী ও রাসূলের হাদিসের ওপর গবেষণা করবেন, তখন পদে পদে অসংখ্য যুক্তি পাবেন, পরিস্থিতির আলোকে বিশ্লেষণ পাবেন, যা আপনার বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করবে। এরপর নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির একটা আলাদা শক্তি তো আছেই। তা কাজে লাগিয়ে আপনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবেন। এভাবে এগিয়ে গেলে সবকিছুই অনেক সহজ ও সাবলীল মনে হবে।

আপনি এ ক্ষেত্রে হজরত আবু বকর সিদ্দিক ﷺ-এর ঘটনাটিও বিবেচনায় নিতে পারেন। যখন রাসূল ﷺ মিরাজ থেকে ফিরে বর্ণনা করেন— তিনি মক্কা থেকে এক রাতেই জেরুজালেমে গিয়েছেন, তারপর সেখান থেকে সাত আসমানে ভ্রমণ করেছেন এবং পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে এসেছেন, তখন আবু জেহেল অনেক উপহাস করেছিল। সে রাসূল ﷺ-কে ঠাট্টা করে বলেছিল— ‘তুমি কী বললে, আবার বলো তো?’ এমনকী অনেক সাহাবিও আল্লাহর রাসূলের বর্ণনায় সন্দেহের মধ্যে পড়ে যান, কীভাবে এক রাতের ভেতর এতটা পথ পরিভ্রমণ করা সম্ভব!

তখনই আবু বকর ﷺ এগিয়ে আসেন আর বলেন—

‘যদি আল্লাহর নবি বলে থাকেন, তিনি এক রাতেই এত সব স্থান ঘুরে এসেছেন, তাহলে এটাই ঠিক। আমি এই মানুষটিকে বিশ্বাস করি। তিনি যদি বলেন তাঁর সাথে এমন কিছু হয়েছে, তাহলে আসলেই হয়েছে। কারণ, তাঁর ওপর আসমান থেকে ওহি নাজিল হচ্ছে এইটা যদি সত্যি বলে বিশ্বাস করি, তাহলে কেন বিশ্বাস করব না যে তিনি এক রাতে মক্কা থেকে জেরুজালেম আবার সেখান থেকে সাত আসমান ঘুরে আসতে পারেন!’

আবু বকর রাঃ-এর এই কথাগুলো আমাদের জন্য বিরাট শিক্ষা। তিনি কিন্তু বলেননি- প্রমাণ দেখান, তাহলে আমি বিশ্বাস করব কিংবা মক্কা ও জেরুজালেমের পথে রাসূল সঃ কিছু দেখেছেন তার নাম বললে বিশ্বাস করব ইত্যাদি। কোনো কিছুই তিনি বলেননি; বরং বলেছেন- ‘আমি জানি এই মানুষটি আল্লাহর নবি। আমি জানি তাঁর কাছে আসমানি ওহি আসে। তাই তিনি যা-ই বলেন, তাঁর ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে।’

ধরা যাক, আল্লাহর রাসূল সঃ তাদের জেরুজালেমের মসজিদ সম্পর্কে কোনো কিছুর বর্ণনা দিলেন। যেমন : তিনি হয়তো বললেন, মসজিদের অমুক জায়গায় পানি রাখা আছে। তাহলে উপস্থিত মক্কাবাসী তা কীভাবে যাচাই করবে? এখনকার সময়ের মতো তখন তো মেসেজ বা ফোন দেওয়ার সুবিধা ছিল না। তিনি যদি এ ধরনের কোনো উদাহরণও দিতেন, তারপরও কি তাদের ঈমান মজবুত হতো? রাসূল সঃ তখনই এ ধরনের উদাহরণ বা প্রমাণ দিয়েছেন, যখন এর কারণে মানুষের উপকার ও বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে।

মূল কথা হলো- প্রাথমিকভাবে বিশ্বাস আনার জন্য উদাহরণ বা প্রমাণের দরকার নেই। হজরত ইবরাহিম (আ.) মানসিক স্বস্তির জন্য যে প্রমাণ দেখতে চেয়েছিলেন, তা প্রাথমিক বিশ্বাস আনার জন্য নয়; বরং পরবর্তী স্তরের ব্যাপার, যার সাথে ঈমান আনার কোনো সম্পর্ক নেই। সেটা ছিল স্বস্তি পাওয়া কিংবা ঈমান আরও মজবুত করার।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন-

‘আমি তাদের এই বিশ্বজগৎ এবং তাদের নিজেদের মধ্যে থাকা আমার নিদর্শনাবলি প্রদর্শন করব- যতক্ষণ না তাদের কাছে প্রতীয়মান হয়, এ কুরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়?’ সূরা হামিম আস-সাজদাহ : ৫৩

এই আয়াতে আল্লাহ পরিষ্কারভাবেই বলেছেন, এই বিশ্বজগতে এবং চারপাশের সৃষ্টিকুলের মাঝে আমি অসংখ্য প্রমাণ দিয়েছি, যাতে বোঝা যায়- এসব কোনো কিছুই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সম্ভব হতো না। আর এই নিদর্শনগুলোর প্রয়োজন আছে, যাতে আমরা সত্যকে চিনে নিতে পারি। যখন কেউ সত্যকে চিনবে, তখন সবকিছুরই ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে পারবে।

বেশিরভাগ মানুষ সত্য খুঁজতেই গোটা জীবন পার করে। তাই তারা সত্যের স্বাদ এবং জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পায় না। আমরা কোন উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে এসেছি তাও অনুধাবন করতে পারি না।

বিশ্বাসী মানুষ এবং মুসলিম হিসেবে আমরা কিন্তু সত্যের কাছে ইতোমধ্যেই পৌঁছেছি। আমরা জানি, কোনটা সত্য। তাই এখন আমাদের কাজ সত্য খোঁজা নয়; বরং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝা এবং তা পূরণের জন্য কাজ করা।

নাস্তিকদের কথা চিন্তা করুন- যখনই আপনি তাদের সাথে কোনো বিতর্কে লিপ্ত হবেন, শেষ পর্যায়ে এসে তারা অজ্ঞ হয়ে যায়। তাদের সামনে স্রষ্টাবিষয়ক প্রমাণাদি উপস্থাপন করলে বলে-

‘একজন সৃষ্টিকর্তা বা ঐশ্বরিক কোনো শক্তি থাকতে পারে, কিন্তু ধর্ম বলে কিছু আছে— আমরা তা মানি না। আমাদের এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, আর প্রাকৃতিকভাবেই সব হচ্ছে এবং হবে।’

এই কথার উত্তর খুবই সামান্য। এ ধরনের মন্তব্যকারীদের উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন তুলতে হয়—

‘তাহলে কি আপনারা মনে করেন, এই যে এত সব সৃষ্টি তা কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই হয়েছে? আল্লাহ নামক একটি সত্তা যদি থেকেই থাকে, তাহলে তিনি কি এসব অহেতুক সৃষ্টি করেছেন?’

অথচ আল্লাহ পরিষ্কারভাবে কুরআনে বলেছেন—

‘আমি উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কিছুই সৃষ্টি করিনি।’

তাই বিশ্বাসীদের বুঝতে হবে— সৃষ্টি নিয়ে সংশয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই; বরং এই বিশাল সৃষ্টির পেছনে যে উদ্দেশ্য আছে, তা খুঁজে বের করতে হবে। তারপর সেই উদ্দেশ্য পূরণে সচেষ্ট হতে হবে।

স্রষ্টা/সৃষ্টিকর্তা

সবকিছুর শুরু কোথা থেকে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন থেকে, যার কোনো উৎস নেই। রাসূল ﷺ বলেছেন—

‘সবকিছুর শুরুতে ছিলেন আল্লাহ তায়ালা, তখন অন্য কিছুই ছিল না।’

তখন আরশ, পানি, আকাশ, পৃথিবী কিছুই ছিল না। তিরমিজি শরিফে একটি হাদিস আছে— আবু রাজিন রাঃ একবার রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলেন— ‘সবকিছু শুরু হওয়ার আগে আল্লাহ কোথায় ছিলেন?’ জবাবে রাসূল ﷺ বলেছিলেন— ‘শুধু আল্লাহই ছিলেন। তাঁর সামনে, পেছনে, আগে ও পরে আর কেউ ছিল না; কিছুই ছিল না।’

রাসূল ﷺ এই কথার মাঝে একটা ইঙ্গিত আছে। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো সৃষ্টিই সম্ভব হতো না। আর আমরা যারা সৃষ্টির তালিকায় আছি, তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছু জানার দরকারও নেই। নবিজি ﷺ খুব সুন্দরভাবেই বলেছেন— ‘আল্লাহ ছাড়া অন্য যত সত্তা আছে, সবকিছুই প্রয়োজন শেষে ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহই একমাত্র সত্তা— যিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।’

হজরত আবু রাজিন রাঃ কেন এই প্রশ্নটি তুললেন। তিনি রাসূল ﷺ-কে বলেছিলেন— বিভিন্ন আয়াত বা হাদিসে যখন পড়ি, আল্লাহ এই বলেছেন বা করেছেন, তখন মানুষের স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতার জায়গা থেকে তাঁকে বিবেচনা করতে শুরু করি। যেমন : একটি হাদিসে বলা হয়েছে,

আল্লাহ রাতের শেষ দিকে নেমে আসেন এবং কেউ যদি তাঁর কাছে চোখের পানি নিয়ে সাহায্য চায়, তাহলে দুআ কবুল করেন।

এ রকম কথা শুনলেই মনে নানা চিন্তা চলে আসে। আল্লাহ কীভাবে নেমে আসবেন? শেষ রাতে যদি তিনি নেমে আসেন, তাহলে রাতের প্রথম বা দ্বিপ্রহরে কি তিনি থাকেন না? তিনি রাতের শেষ ভাগটা কীভাবে নির্ণয় করেন? লাইলাতুল কদরে তাহলে কী হয়? ইত্যাদি নানা ভাবনাই মানুষের মনে আসতে পারে।

এসব ভাবনা আসে কারণ, আমরা মানবিক সীমাবদ্ধতা দিয়ে আল্লাহকে বিবেচনা করি। আমরা আল্লাহকে চেনা সময় ও বাহ্যিক কাঠামোর ভেতর বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করি। এটা হওয়া উচিত নয়। কারণ, আল্লাহ এসব কিছুই উর্ধ্বে। আল্লাহ সময়ের ফিতায় আটকে থাকেন না; তিনি সময় নিয়ন্ত্রণ করেন।

আবার অন্য এক বিষয় ধরা যাক। প্রশ্ন আসতে পারে, আল্লাহ কি সবার দুআ শুনতে পান? যেমন : আরাফাতের দিন লাখো মানুষ একই ময়দান থেকে আল্লাহকে ডাকে, আলাদা আলাদা ভাষায় তাঁর কাছে দুআ করে, আর আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের প্রতিটি দুআ শুনতে পান। কেন শোনে? কীভাবে শোনে? কারণ, তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। তিনিই সময় সৃষ্টি করেছেন। তাই আমরা যে সময়ের কাঠামো নির্মাণ করি, তিনি তার অংশ নন। তিনি আমাদের কোনো ভাবনার মতোই নন।

জ্ঞানীরা বলেন— মানুষ আল্লাহর কথা ভাবতে গিয়ে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে। আল্লাহর কোনো ছবি কল্পনা করে নেয়, কিংবা পরিচিত কোনো বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আল্লাহ এসব ভাবনা বা মানবিক দৃশ্যপটের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ নন। মানুষের মন বা মেধা দিয়ে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা করা কখনোই সম্ভব নয়।

সবকিছুর শুরুতে যে শুধু আল্লাহই ছিলেন এবং তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাসূল ﷺ একটি চমৎকার দুআ শিখিয়ে দিয়েছেন—

‘আল্লাহুম্মা আনতাল আউয়ালু ফালাইসা কাবলাকা শাইয়া ওয়া আনতাল আখারু ফালাইসা বা’দাকা শাইয়া ওয়া আনতাজ জাহিরু ফালাইসা ফাওকা শাইয়া ওয়া আনতাল বাতিনু ফালাইসা জুনা কা শাইয়া।

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আপনি সবকিছুর শুরুতে ছিলেন। আপনার আগে কেউ ছিল না। আবার আপনি হলেন সর্বশেষ, তাই আপনার পরেও কেউ নেই। আপনি প্রকাশ্য, তাই আপনার ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা নেই। একই সঙ্গে আপনি গোপন, তাই আপনার ব্যাপারে আমাদের কোনো জ্ঞানও নেই।’

এই দুআর মাধ্যমে নবিজি ﷺ শিখিয়েছেন, আল্লাহই প্রথম এবং শেষ সত্তা। একই সঙ্গে আল্লাহ গোপন ও প্রকাশ্য একটি সত্তা।

সূরা আল হাদিদের ৩ নং আয়াতে ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, যেখানে আল্লাহ নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

‘তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং তিনি সব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।’

আলেমরা এই আয়াতের অনুবাদ এভাবে করার কথা বলেছেন— তিনিই প্রথম, যদিও তিনি সর্বশেষ। তিনিই প্রকাশ্য, যদিও তিনি গোপন এক সত্তা।

আপনি যখন এভাবে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও শক্তির বিষয় চিন্তা করবেন, তখন মনে হতে পারে— তিনি একজন মহারাজ, কিন্তু তাঁর সাথে কারও কোনো সম্পর্ক নেই। তখনই প্রচলিত ধারণায় ভেবে নিতে পারি, সাধারণত অধীনস্থদের সাথে রাজাদের কোনো যোগাযোগ থাকে না। রাজারা ঠিকমতো জানেও না— অধীনস্থরা কেমন আছে বা কী করছে।

এ জন্যই আল্লাহ কুরআনে নিজের ও সৃষ্টিকুলের পরিচয়, ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডলের সৃষ্টির যাবতীয় উপাখ্যান বর্ণনা করার পর নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বলেছেন—

‘তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। তাঁর জানার বাইরে একটা পাতাও ঝরে না। তাঁর অনুমোদন ছাড়া কোনো শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোনো অর্দ্ধ ও শুষ্ক দ্রব্যও মাটিতে পড়ে না।’ সূরা আনআম : ৫৩

রাসূল ﷺ আমাদেরও খুব সুন্দরভাবে শিখিয়েছেন। একটি চমৎকার হাদিস আছে, যেখান থেকে আল্লাহ তায়ালাকে গুণবাচক নামে ডাকার সূত্র পাই।

তিনি বলেন— ‘তোমরা আল্লাহকে তাঁর সুন্দরতম নামগুলো দিয়েই ডাকো।’

এই নামগুলো কি তা অবশ্য তিনি বলেননি। তবে তিনি বলেছেন, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ গুণবাচক নামগুলো পাওয়া যায় পবিত্র কুরআনের সূরা আল বাকারায়, সূরা আল ইমরানে ও সূরা আল ত্ব-হায়।

সূরা আল বাকারায় আছে আয়াতুল কুরসি, যা কুরআনের সবচেয়ে বড়ো আয়াত। সেখানে একবারে প্রথমেই আমরা আল্লাহর যে পরিচয় পাই তা হলো— আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক বা নিয়ন্ত্রক।

একই বৈশিষ্ট্যমূলক পরিচয় পাওয়া যায় সূরা ইমরানের শুরুতেও। সেখানে বলা হয়েছে— আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছু তিনিই ধারণ করে আছেন।

আবার সূরা ত্ব-হাতেও তিনি বলেছেন— ‘যা কিছু দেখছ, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর এগুলো সবই আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করা হবে, যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী।’

আলেমরা এই চিরঞ্জীব ও ধারণ/নিয়ন্ত্রণ করার বৈশিষ্ট্য দুটোকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তারা বলছেন, সাধারণভাবে আমরা আল্লাহর যতগুলো সিফাত বা গুণবাচক নাম জানি, তার সবগুলোই এই চিরঞ্জীব বৈশিষ্ট্যের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর যে সিফাতগুলো আল্লাহর কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেগুলো ধারণ/নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই দুটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণভাবে আমরা দেখি— মানুষ যত বয়স্ক, তত সে অক্ষম। কিন্তু আল্লাহর সক্ষমতায় কখনোই তারতম্য হয় না। আল্লাহ জীবিত ও চিরঞ্জীব। তিনি আগেও ছিলেন, এখনও আছেন, সব সময় থাকবেন।

একই সঙ্গে আল্লাহ সব সময়ই সবকিছুর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর কোনো বয়স নেই। তিনি কখনো অক্ষম হন না। আয়াতুল কুরসির সেই আয়াতেই আল্লাহ বলেছেন— তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা চিরঞ্জীব। সবকিছুর একমাত্র ধারণকারী, একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, সেগুলো তাঁর জন্যই টিকে আছে; অস্তিত্ব ধারণ করে আছে। আল্লাহই শুরুতে ছিলেন, তাঁর আগে কিছুই ছিল না, তিনি অসীম। আর তাঁর পরে যা সৃষ্টি হয়েছে, সবই সীমাবদ্ধ। আল্লাহর কিছু করতে কোনো কারণ লাগে না। কিন্তু অন্যসব সৃষ্টিরই কিছু করতে বা হওয়ার পেছনে কারণ থাকার প্রয়োজন হয়।

আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিনে আমাদের অনন্ত সফলতা দান করুন।